http://www.prothomalo.com/opinion/article/1531626/%E0%A6%AC%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A7-%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%95%E0%A7%81%E0%A6%B2%E0%A7%87-%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%B0%E0%A6%AA%E0%A6%BF%E0%A6%9F

প্রথম আলো

বন্ধ হোক স্কুলে মারপিট

গওহার নঈম ওয়ারা

১৩ জুলাই ২০১৮, ০৮:৪৬
আপডেট: ১৩ জুলাই ২০১৮, ০৮:৪৮

গত জুমায় (৬ জুলাই) একটা বনেদি এলাকার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সেখানে বাংলায় বয়ান চলছিল। বিষয় ছিল শিক্ষকদের শাসন করার অধিকার; সেই অধিকার কতটা নিরঙ্কুশ, কতটা প্রশ্নাতীত, সেসব জানাচ্ছিলেন ছাত্রদের। নানা আলেম নানা ওস্তাদের

জীবনের রেফারেন্স টেনে তিনি তাঁর বক্তব্যকে অকাট্য যুক্তির তখতে বসানোর চেষ্টা করছিলেন। অনেক ওস্তাদ বা শিক্ষকের ধারণা হতে পারে, শাসনের অধিকার মানে মারধর আর গালিগালাজের নির্বিচার গোলাবর্ষণ। অনেকেই বলেন, আমার ওস্তাদ আমার শিক্ষক আমাকে পিটিয়েই মানুষ করেছেন; অতএব পিটানোর লাইসেন্স আমরা উত্তরাধিকারসূত্রেই অর্জন করেছি। এসব নিয়ে প্রশ্ন তোলাটাই বুরবুকি। অতীতের মুরব্বিদের অনুসরণের মধ্যে আইন পরিপত্র এসব আবার কী?

এ রকম বয়ানের পেছনে নিশ্চয় কোনো কারণ বা পটভূমি থাকে, অথবা থাকে সরল অনুরোধ। কোনো অভিভাবক কি আপত্তি তুলেছেন বা কোনো শিক্ষার্থী? জানি না, তবে দিন কয়েক আগে শিক্ষকের বেতের আঘাতে মাদারীপুরের ফুটফুটে শিশু সম্পা তার একটা চোখ হারাতে বসে। পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী সম্পা আক্তার মাদারীপুর শহরের দরগাখোলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। গত ২ জুলাই ক্লাসে একটু হাসার জন্য শিক্ষক খেপে গিয়ে তাকে বেত দিয়ে পেটাতে থাকেন। একপর্যায়ে তার বাঁ চোখে গুরুতর আঘাত লাগে। আহত সম্পাকে তার সহপাঠীরা বাসায় নিয়ে আসে। পরিবারের লোকজন মাদারীপুর চক্ষু হাসপাতালে ভর্তি করে। সম্পার চোখ দিয়ে রক্ত পড়া বন্ধ না হওয়ায় পরদিন উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব চক্ষু হাসপাতালে নেওয়া হয়।
সম্পার সহপাঠীরা জানিয়েছে, শিক্ষকেরা কারণে-অকারণে তাদের বেত দিয়ে মারধর করেন। তারা সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। ভয়ে কিছু বলে না। শম্পা যতটা না ব্যথা পেয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি ভয় পেয়েছে চোখ দিয়ে রক্ত পড়া দেখে; ভয় পেয়েছে তার সহপাঠীরাও।

জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নাসিরউদ্দিন আহম্মেদ প্রথম আলোকে বলেন, ‘শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগটি সঠিক। আমি বিষয়টি শুনে আজ সকালেই সম্পাকে দেখতে যাই। তার বাঁ চোখে গুরুতর আঘাত লেগেছে। আমি চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলেছি। ইতিমধ্যে অভিযুক্ত ওই শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’ অভিযুক্ত শিক্ষক বলেছেন, ‘বিষয়টি এভাবে গড়াবে বুঝতে পারিনি।’ তিনি এখন চিকিৎসা খরচের বিনিময়ে একটা আপস করার চেষ্টা করছেন। হয়তো সময়ে একটা আপস হয়ে যাবে। কিন্তু এই শিশু নিগ্রহ কি বন্ধ হবে? আমরা কি জানতে পারব সম্পা ও তার সহপাঠীরা শাস্তিমুক্ত এক স্বস্তিকর পরিস্থিতি ফিরে পেয়েছে কি না? আমরা কি জানি, শেষ পর্যন্ত মাহিম হাওলাদার কেমন আছে? বাংলাদেশের

দক্ষিণের জেলা বরিশালের মুলাদি উপজেলার ফজলুল উলুম সেরাতুল কুরআন মাদ্রাসার শিশুশ্রেণির ছাত্র ছিল সে। বাড়ি থেকে গোসল না করে ক্লাসে যাওয়ার অপরাধে তাকে ঠান্ডা পানিতে দাঁড় করিয়ে পেটে আগুনের ছেঁকা দিয়ে শাস্তি দেন তার ক্লাস শিক্ষক। আহত শিশু মাহিমকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।

শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়া বাদ দেওয়ায় মাগুরা সদর উপজেলার আলোকদিয়া পুকুরিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির ছাত্র সাকিবুল ইসলামকে ইংরেজি শিক্ষক মো. মুজাহিদুল ইসলাম বেত দিয়ে এমনভাবে পেটান যে তাকে শেষ পর্যন্ত হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। এ রকম ঘটনার তালিকা অনেক লম্বা।
অনেক শিক্ষক, এমনকি অভিভাবকরাও মনে করেন, মারপিট-শাস্তি ছাড়া শৃঙ্খলা সম্ভব নয়। এ ছাড়া কোনো উপায়ও নেই। বাংলাদেশে শিশুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বাড়িতে শারীরিক শাস্তি নিয়ে ইউএনডিপি একটি জরিপ পরিচালনা করে ২০১৩ সালে।
সাক্ষাৎকারভিত্তিক সেই জরিপে দেখা যায়, প্রতি ১০ জন শিশুর মধ্যে ৯ জন জানিয়েছে যে তারা তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তির শিকার হয়েছে। তা ছাড়া প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জন শিশু জানায় যে তারা বাড়িতে অভিভাবকদের হাতে শারীরিক শাস্তি পেয়ে থাকে।

অন্যদিকে ইউনিসেফের জরিপ বলছে, ২০১০ সাল পর্যন্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শতকরা ৯১ ভাগ এবং বাড়িতে শতকরা ৭১ ভাগ শিশু শারীরিক শাস্তির শিকার। জরিপে বলা হয়, বাংলাদেশের স্কুলগুলোয় বেত বা লাঠির ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে এবং ৮৭ দশমিক ৬ শতাংশ ছাত্র এই বেত বা লাঠির শিকার হয়।
গত বছর নভেম্বর মাসে ঢাকায় ছাত্রদের শাস্তি প্রদানের ওপর এক গণশুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আয়োজকেরা তাদের এক জরিপের ফলাফলের সূত্র দিয়ে জানায়, অভিভাবকদের ৫৫ শতাংশ মনে করছে, স্কুলে শাস্তির মাধ্যমে শিশুকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনা যায়। আবার ২৭ শতাংশ মনে করছে, শাস্তি না হলে শিশুরা বখে যায় এবং ২৫ শতাংশের মতে, শাস্তি দিলে শিশুরা শিক্ষকদের কথা শোনে। আইনি সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ব্লাস্ট পরিচালিত এক জরিপে বলা হয়েছে, '৬৯ শতাংশ বাবা-মা নিয়মানুবর্তিতার জন্য স্কুলে শিশুদের বেত্রাঘাতসহ শাস্তির বিধানের পক্ষে।'

সরকারি প্রজ্ঞাপন নীতিমালা জারি করে অনেক দিন থেকেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিশু নিগ্রহ বন্ধের নানা চেষ্টা চলছে ২০১১ সালে হাইকোর্ট শিশুদের শারীরিক শাস্তি দেওয়ার বিষয়টি

বেআইনি এবং অসাংবিধানিক বলে ঘোষণা করে। হাইকোর্টের নির্দেশনা অনুযায়ী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় আবার একটি পরিপত্রও জারি করে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ পরিপত্র অনুযায়ী নিষিদ্ধ করা শাস্তিগুলো হলো: হাত-পা বা কোনো কিছু দিয়ে আঘাত বা বেত্রাঘাত, শিক্ষার্থীর দিকে চক বা ডাস্টার-জাতীয় বস্তু ছুড়ে মারা, আছাড় দেওয়া ও চিমটি কাটা, কামড় দেওয়া, চুল টানা বা চুল কেটে দেওয়া, হাতের আঙুলের ফাঁকে পেনসিল চাপা দিয়ে মোচড় দেওয়া, ঘাড়ধাক্কা, কান টানা বা ওঠবস করানো, চেয়ার, টেবিল বা কোনো কিছুর নিচে মাথা দিয়ে দাঁড় করানো বা হাঁটু গেড়ে দাঁড় করে রাখা, রোদে দাঁড় করে বা শুইয়ে রাখা কিংবা সূর্যের দিকে মুখ করে দাঁড় করানো এবং ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে এমন কোনো কাজ করানো, যা শ্রম আইনে নিষিদ্ধ।
এই পরিপত্রে শাস্তির কথাও বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কেউ শিশুদের শারীরিক শাস্তি দিলে ১৯৭৯ সালের সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার পরিপন্থী হবে এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। অভিযোগের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর আওতায় অসদাচরণের অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যাবে। প্রয়োজনে ফৌজদারি আইনেও ব্যবস্থা নেওয়া যাবে।

কিন্তু এই আইন যেন কোনোভাবেই কার্যকর হচ্ছে না। কেউ সেভাবে অভিযোগও করছে না, মারপিট বন্ধ হয়নি।

গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধূরী বলেন, যাঁরা শিক্ষকদের মারপিট বন্ধের জন্য প্রশিক্ষণ দেন, তাঁরা নিজেরাই কতটুকু সচেতন, সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। আর শারীরিক নির্যাতন বন্ধ হলেও মৌখিকভাবে নির্যাতন বন্ধ হয়নি। এ বিষয়ে নীতিনির্ধারকদের এগিয়ে আসতে হবে।

গওহার নঈম ওয়ারা: ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক